আমার জীবন কথা

বীর মুক্তিযোদ্ধা দেবেশ চন্দ্র সান্যাল

আমার জন্ম ৯ অগ্রহায়ন ১৩৬১ বঙ্গাব্দে। দিন টি ছিল রবিবার। রাস পূর্নিমা তিথি। ইহা ছিল ইংরেজি ২৬ নভেম্বর'১৯৫৪। আমার পিতৃদেবের নাম শ্রী দ্বিজেন্দ্র নাথ সান্যাল। মাতৃদেবীর নাম শ্রী মতী নিলীমা রানী সান্যাল। আমার মাতৃদেবীর কাছ থেকে শুনেছি- তখনকার দিনে সপ্তম মাসে সারম্বরে মায়েদের সাধভক্ষন অনুষ্ঠান হতো। সেই অনুষ্ঠানে বাজনা করা হতো। আত্মীয় স্বজনদের নিমন্ত্রন করা হতো। আমার জন্ম স্থান রতন কান্দি গ্রামের নিজ বাড়িতে। আমার জন্ম কালিন সময়ে কুঁড়েঘর (আতুর ঘর) তৈরী করা হতো। ঘরের চার দিকে কাগজে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে লিখে লাগিয়ে দেওয়া হতো। সনাতন ধর্ম মতে শিশু জন্মের ৬ দিনের দিন অর্থাৎ ষষ্ঠীতে ভগবান শিশুর ভাগ্য লিপি লিখে থাকে। তাই এই ছয় ষষ্ঠীর রাতে মাতৃদেবী সন্তান কে কোলে নিয়ে রাত্রি জাগরণ করে থাকেন। ষষ্ঠী পূজা করা হয়। কীর্ত্তনাদি করা হয়। খাবার ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। জন্মাশৌচ পর্যন্ত মাতৃদেবী গণ কুড়ে ঘরে থাকতেন। অন্যরা ভাত জল করতেন। আমার বড় দাদার ভাত জল করেছেন আমার মাসীমা কুমারী সুনীতি চক্রবর্ত্তী (সুনু)। জন্মাশৌচ শেষে কুড়েঘরে (আতুর ঘর) পুড়িয়ে দেওয়া হতো। স্নান-ক্ষৌর কর্ম ও সূর্যার্ঘ্য করে মাতৃদেবীদের ঘরে উঠতে হতো। ধাত্রী মাতার সহযোগীতায় প্রসব করানো হতো। রোগ-বালাই প্রতিরোধক/ প্রতিশেধক কোন টিকার প্রচলন ছিল না। অপরিস্কার ব্লেড ও অন্যান্য দিয়ে নাড়ি কাঁটার জন্য অনেক সময় শিশুদের ধনুটংকার হতো। শিশুরা দুধ ছাড়তো। শিশু মাতৃদেবীর দুধ টানতে পারতো না। গ্রামের ওঝাড়া ইহাকে ভূতে ধরা বলতো। গ্রামীন কিছু কবিরাজকে ডেকে এনে ঝাড়/ফোঁক দেওয়ানো হতো। আমরা ৪ ভাই ১ বোন। আমাদের বড়দাদার নাম- দেবেন্দ্র নাথ সান্যাল (সুকুমার) মেজ দাদার নাম- সমরেন্দ্র নাথ সান্যাল (ভবেশ), আমার নাম -দেবেশ চন্দ্র সান্যাল ভাইয়ের নাম- সৌমেন্দ্র নাথ সান্যাল (শমেন) বোনের নাম-দুলালী রানী সান্যাল। আমাদের পরিবার টি একটি বৈষ্ণব গোস্বামী পরিবার। পাকিস্তান পূর্ব কালীন সময়ে আমাদের বংশের রতন কান্দি, নন্দলাল পুর, ভুল বাকুটিয়া ও মোয়াকোলা মৌজায়- জমি ছিল। পাকিস্তান পূর্ব আমাদের বংশের উপাধি ছিল "অধিকারী" আমাদের বাড়িতে মন্দির ছিল। আমাদের পারিবারিক মন্দিরে নিত্য পূজা হতো। মন্দিরে নারায়ন শীলা, শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ ও গোপাল সহ বিভিন্ন দেবদেবীর বিগ্রহ ছিল। আমাদের পবিরার টি শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণের উপাসক ছিলেন। সারা বছর বিভিন্ন পূজা-অর্চনা ও পার্বণাদি অনুষ্ঠিত হতো। পঞ্চম দোল হতো বেশী সারম্বরে। পঞ্চম দোল উপলক্ষে মন্দির এলাকায় ৫ দিন ব্যাপী মেলা বসতো। নাম যজ্ঞ, লীলা কীর্ত্তন ও ভক্ত সেবা হতো। আমাদের পরিবারের অনেক শিষ্য ছিল।

পঞ্চম দোল উপলক্ষে শিষ্য -শিষ্যারা আসতো। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরিবারের বংশ ধরেরা অধিকাংশ জমি জমা ঘর বাড়ি বিক্রয় করে ভারতে চলে গেছেন। আমাদের মন্দিরের সেবা পূজার জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল। দেবোত্তর সম্পত্তি বিক্রয় করে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে ভারতের কাটোয়াতে মন্দির করেছেন। আমাদের মন্দিরের টিন ও অন্যান্য বিগ্রহ নৌকা যোগে কাটোয়াতে নিয়ে (প্রতিষ্ঠিত) করেছেন। মন্দিরে নিত্য পূজা-অর্চনা হয়। ভারত পাকিস্তান ভাগ হওয়ার সময়ে গুজব উঠেছিল। ভারত হবে হিন্দুদের দেশ আর পাকিস্তান হবে মুসলমানদের দেশ। এই গুজব বিশ্বাস করে আমাদের বংশের অন্যান্যদের সাথে আমার পিতৃদেব ও মাতৃদেবীও ভারতে স্থায়ী বসবাস গড়ার জন্য ভারতের বালুর ঘাটে চলে গিয়ে ছিলেন। তখন শুধু আমার বড় দাদা দেবেন্দ্র নাথ সান্যাল(সুকুমার) এর জন্ম হয়েছিল। অন্য দেশের আবাহাওয়ায় আমার পিতৃদেবের শরীর ভালভাবে চলছিল না। পাকিস্তান সৃষ্টির পর জানা গিয়েছিল গুজব সত্য নয়। হিন্দু মুসলমান যিনি যে দেশে বসবাস করতে ইচ্ছুক, তিনি সেই দেশেই বসবাস করতে পারবেন। তখন আমার পিতৃদেব ও মাতৃদেবী আমার বড় দাদাকে নিয়ে জন্ম ভূমি পূর্ব পাকিস্তানের রতন কান্দি গ্রামে ফিরে এলেন। আমাদের পৈত্রিক বাড়ি ও অন্যান্য কিছু জমি বংশ ধরেরা অবিক্রিত রেখে গিয়েছিলেন। পৈত্রিক ভিটাতে ঘর করে ও অন্যান্য কৃষি জমি নিয়ে আমার পিতৃদেব ও মাতৃদেবী সংগ্রামী পরিবার শুরু করলেন। পাকিস্তান আমলে আমার, মেজদাদা, ভাই ও বোনের জন্ম।

তখন আমাদের দেশে জন্ম নিবন্ধন বিধি প্রচলিত ছিল না। শিক্ষাগত নিবন্ধন কালীন সময়ে প্রধান শিক্ষক গন শিক্ষাবোর্ডের বিধি অনুসারে জন্ম তারিখ লিখে দিতেন। নবম শ্রেণিতে রেজিষ্টেশন কালীন শিক্ষা বোর্ডের নির্ধারিত বয়সের মাপ কাঠির ভিত্তিতে প্রধান শিক্ষক গন বয়স নির্ধারণ করতেন। সম্ভবত ১৫-১৬ বছর সীমা রেখায় এস.এস.সি পরীক্ষায় অংশ গ্রহনের বিধান ছিল। প্রধান শিক্ষক গণ বয়স লিখতে ছাত্রের পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থাও বিবেচনা করতেন। কোন ছাত্রের তাড়াতাড়ি সরকারি চাকরি পাবার মানোভাব থাকলে বয়স বাড়িয়ে দিতেন। আবার কোন ছাত্রের বেশী লেখা পড়ার সম্ভাবনা থাকলে বয়স কমিয়ে দিতেন। আমি ষষ্ঠ শ্রেণি ও অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়ন করেছি রতন কান্দি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। স্বাধীনতার পর রতন কান্দি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে অষ্টম শ্রেণির অটো পাশের টিসি নিয়ে শাহজাদপুর বহু পার্শ্বিক উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে ছিলাম। তখন আমার বড় দাদা দেবেন্দ্র নাথ সান্যাল এম.কম. এম এড ছিলেন রতন কান্দি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক। তিনি আমার জন্ম তারিখ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ দিয়েছেন। ছোট বেলায় বুদ্ধি হওয়ার পর যা স্মরণে আসে তা হলো - বাবা-মা ও বড় দাদাদের কথামত চলতাম। লেখা পড়া করতাম তবে এ যুগের মত লেখা পড়ার এত চাপ ছিল না। বাড়ির কাছ দিয়ে প্রবাহিত করতোয়া নদীতে এবং বর্ষা কালে বাড়ির ঘাটে ও বাড়ির কাছের পালেদের বিলে সাতাঁর কাটতাম। লাটিম,

হাডুডু, ফুটবল, ভলিবল, রেডি, মার্বেল ও অন্যান্য খেলা করতাম। সাথীদের সাথে ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। বাবা মাকে সংসারের ও পূজা অর্চনার কাজে সহযোগীতা করতাম।

৯ বছরের বেশী বয়সে ১৯৬৪ সালের ১ জানুয়ারী আমি রতন কান্দি দক্ষিন পাড়া (বর্তমানে মধ্য সরকারি) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে লেখা-পড়া শুরু করে ছিলাম। তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক প্রাথমিক শ্রেণী ছিল না। স্বাধীনতা পূর্ব আমাদের দেশে কিন্ডার গার্ডেন স্কুল ছিল কী না জানা নাই। তবে আমাদের গ্রামে কোন কিন্ডার গার্ডেন বিদ্যালয় ছিল না। প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ সরকারি ছিল না। এখনকার মত বিনা মূল্যে সরকারি বই পাওয়া যেত না। পুস্তক বিক্রেতাদের কাছ থেকে বই কিনে পড়তে হতো। একজন ছাত্র বার্ষিক পরীক্ষায় উর্ত্তীন হয়ে উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তি হলে তার পুরাতন বই গুলো ইচ্ছুক নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিক্রি করতো। দাম ছিল নতুন বইয়ের নির্ধারিত মূল্যের তিন ভাগের এক ভাগ। তখন পঞ্চম শ্রেণিতে বৃত্তি পরীক্ষা হতো। প্রধান শিক্ষক পঞ্চম শ্রেণির মেধা তালিকার ৫/৬ জন ছাত্র-ছাত্রী কে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহনের জন্য নির্বাচন করতেন। এই সকল ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ যত্ন নিয়ে - পড়ানো হতো। আমি ১৯৬৮ সালের পঞ্চম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হয়ে ছিলাম। আমাদের কে ক্লাসে স্যারেরা পড়াতেন। রাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক মৌলভী মোহাম্মদ হোসাইন স্যারের বাড়িতে একটি ঘরে থেকে স্যারের তত্ত্বাবধানে লেখা-পড়া করেছি। প্রথম শ্রেণি হতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ১৯৬৯ সালের ১ জানুয়ারী তে আমার বড় দাদা দেবেন্দ্র নাথ সান্যালের উদ্যোগে রতন কান্দি শেলাচাপড়ী, ভুল বাকুটিয়া, নন্দলাল পুর ও পার্শ্ববতী অন্যান্য গ্রামের বিশিষ্ট জনদের সহযোগিতায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় রতন কান্দি আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আমি রতন কান্দি দক্ষিণ পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে টি, সি নিয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলাম রতন কান্দি আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। আমরা ছিলাম এই বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর প্রথম ব্যাচ। তখন স্কুল টি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে বিদ্যালয় কর্তৃ পক্ষের উদ্যোগে বিভিন্ন বাড়িতে ছাত্র-ছাত্রীদের জায়গীর রেখে দেয়া হতো। ছাত্র- ছাত্রীদের কাছ থেকে নাম মাত্র বেতন নেওয়া হতো। প্রথম গ্রামের বিভিন্ন বাড়ি থেকে বাঁশ তুলে কয়েক খানা টিন কিনে একটি ছাপড়া ঘর তুলে কয়েক টি বেঞ্চ হাই বেঞ্চ টেবিল ও চেয়ার কিনে শুরু করা হয়েছিল এই বিদ্যালয় টি। তখন এলাকায় যখন ধান, চিনা, কাউন, গম, তিল, সরিষা ও অন্যান্য ফসল কাটা হতো তখন বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির উদ্যোগে গ্রামে গ্রামে গিয়ে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা সহযোগিতার জন্য সাহায্য তোলা হতো। আমি ১৯৭০ সালের সপ্তম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার উঠলাম ১৯৭১ সালে অষ্টম শ্রেণীতে উর্ত্তীণ

হলাম। ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ দেশে মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো। স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহন করলাম। ১৬ ডিসেম্বর'৭১ পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে আমাদের দেশ হানাদার মুক্ত হলো। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলো। তখন আমাদের বিদ্যালয় টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকায় এই বিদ্যালয় থেকে অষ্টম শ্রেণির অটোপাশের টি সি নিয়ে ১৯৭২ সালে শাহজাদপুর বহুপার্শ্বিক উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হলাম। তখন অষ্টম শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষা হতো। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলার কারণে স্কুল বন্ধ ছিল। বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল না। আমরা ১৯৭২ সালে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হবার পর অষ্টম শ্রেণীর বৃত্তি দেওয়ার ঘোষণা এলো। ১৯৭৩ সালে শাহজাদপুর বহুপার্শ্বিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের ম্যাগা জিন সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে ছিলাম। আমাদের ছাত্র সংসদ নির্বাচন কে কেন্দ্র করে গ্রাম ও শহর দ্বন্দ্ব বেধে ছিল। এই দ্বন্দ্বে শাহজাদপুরের এম.সি.এ জনাব মোঃ আব্দুর রহমান এর ভাই মোঃ আব্দুল গফুর সরবত ও শেরখালী গ্রামের আমাদের বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র ময়দান কে শত্রু পক্ষ নৃশংস ভাবে হত্যা করে ছিল। ঐ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে আমাদের প্যানেলের নাম ছিল "হাশেম-বাতেন" প্যানেল। আমি ১৯৭৪ সালে বিজ্ঞান বিভাগে শাহজাদপুর বহুপার্শ্বিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে এস.এস.সি পরীক্ষায় উর্ত্তীন হয়েছি। এস,এস,সি পরীক্ষায় উর্ত্তীন হওয়ার পর দেশের অবস্থা ভালো ছিল না। আমি ছিলাম মুক্তিযোদ্ধা। সব সময় আতঙ্ক ছিল স্বাধীনতা বিরোধীরা আমাকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলতে পারে। আই.এস.সি তে ভর্তি হওয়া হলো না। ভারতের চলে যাওয়ার জন্য পাসপোট করলাম। স্বকর্ম সংস্থানের মাধ্যমে জীবন গড়ার পরিকল্পনা করলাম। কয়েক দিন তাঁত বুনানো শিখলাম। কয়েক দিন প্রেসের কাজ শিখলাম। কিন্তু কোন কাজেই মন বসছিল না। ১৯৭৫ সালে জামিরতা কলেজ প্রতিষ্ঠা হলো। বড় দাদা রতন কান্দি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পাশাপাশি ঐ কলেজে খন্ড কালীন প্রভাষকের দায়িত্ব পালন করতে থাকলেন। ১৯৭৬ সালের এইচ. এস.সি পরীক্ষার ফরম পূরনের সময় এলো। বড় দাদা একদিন জামিরতা কলেজ থেকে এসে আমাকে বললেন- "তোকে জামিরতা কলেজ থেকে এইচ. এস.সি পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেই, তবে বিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষা দেওয়া যাবে না। মানবিক অথবা বানিজ্যিক বিভাগ নিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। প্রিন্সিপাল সাহেব বলেছেন- আমার বেতন থেকে ১৫০/ টাকা নিয়ে রেজিষ্ট্রেশন এর কাজ সহ ফরম পূরণ করে দিবেন। ইহাতে কলেজের ও উপকার হবে, আমার কাছে বাড়িতে পড়ে পরীক্ষা দিস।" আমি বড়দাদার কথায় সম্মত হলাম। জামিরতা কলেজ থেকে এইচ.এস.সি (বাণিজ্য) বিভাগ থেকে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ফরম পূরন

করলাম। জীবনে শুধু ফরম পূরণে স্বাক্ষর দেওয়ার জন্য এক দিন ঐ কলেজে গিয়েছিলাম। জামিরতা কলেজের ছাত্র হিসাবে বেড়া কেন্দ্রে পরীক্ষা দিলাম। ১৯৭৬ সালের এইচ.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল বের হলো। আমি বৃহত্তর পাবনা জেলার মধ্যে বানিজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে দ্বিতীয় বিভাগে উর্ত্তীণ হলাম। রাজশাহী শিক্ষাবোর্ড ১৯৭৬ ও ১৯৭৭ সালে এইচ.এস.সি পাশ করা দু'টা ব্যাচ এক করে দিল।

আমি অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালীন সময় থেকে ছড়া, কবিতা, প্রবন্ধ লেখা -লেখি শুরু করেছিলাম। আমি সমাজ কল্যানের জন্য দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক বিষয় নিয়ে ইত্তেফাক, সংবাদ, ও অন্যান্য পত্রিকার চিঠি পত্র কলামে চিঠি লিখতাম। দশম শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালীন সময়ে হরলাল রায়-এর বাংলা ব্যাকরণ বই থেকে শিখে নিয়ে ডাকঘর চাহিয়া দৈনিক ইত্তেকাক পত্রিকার চিঠি পত্র কলামে প্রকাশের জন্য চিঠি লিখে ছিলাম। চিঠি টি পত্রিকায় প্রকাশের পর ডাক বিভাগের এক উর্ধতন কর্মকর্তা আমার নামে চিঠি লিখে ছিলেন যে- "আগামীতে আপনার গ্রামে শাখা ডাকঘর খোলা হবে। ইহার পর বিধি মোতাবেক ১৯৭৬ সালে আমার গ্রামে শাখা ডাকঘর খোলা হয়েছে। আমার লেখা বিভিন্ন ছড়া, কবিতা, ধর্ম বিষয়ক নিবন্ধ/ প্রবন্ধ মাসিক সমাজ দর্পন, শ্রী গৌর বানী, ভারত বিচিত্রা, নিরীক্ষা ও অন্যান্য বই/ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আমার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ধর্ম সাহিত্য নিয়ে লেখা- লেখি করেছি। আমি চাকরি হতে অবসর হওয়ার পর উত্তরাধিকার'৭১ নিউজ নামক অন লাইন পত্রিকা ও দৈনিক বাংলা'৭১ প্রিন্ট পত্রিকার নিজস্ব সংবাদ দাতা হিসেবে কর্মরত ছিলাম। আমি ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রীয় কচিকাচার মেলার অনুমোদন নিয়ে নিজ গ্রামে রতন কান্দি ঝিকিমিকি কচি কাঁচার মেলা প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। ১৯৮০ সালে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র, বাংলাদেশ এর অনুমোদন নিয়ে রতন কান্দি গ্রন্থ সুহৃদ সমিতি (রেজি নং-৭১) প্রতিষ্ঠা করেছি। বাংলাদেশ বেতার- এর প্রকাশনা শাপলা শালুক পত্রিকায় আমার ছড়া কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। আমার লেখা প্রথম ছড়া কবিতা টি ছিল-

সময়

জোটে যদি, মোটে একটু সময়

লেখা-পড়া করে, জীবন কর সুখময়। তার চেয়ে আর একটু বেশী যদি পাও,

জীবনে অমর হবার পথ বেছে নাও

লেখা পড়া দূর করে দারিদ্র্যতার গ্লানি,

সাহিত্য সাধনা দেয় স্বর্গ-সুখ আনি ।

১৯৭৮ সালে শাহজাদপুর মহা বিদ্যালয়ে বি.কম ভর্তি হলাম । এইচ.এস.সি পরীক্ষা পাশের জন্য বি.কম অধ্যয়ন কালীন সময়ে মাসিক ৮০/- হিসেবে বৃত্তি পেলাম । বই কেনার জন্য এক কালীন ২৫০/- টাকা পেলাম । আমি ১৯৭৮ সালের শাহজাদপুর মহা বিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ম্যাগাজিন সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলাম । তখন রাজনৈতিক পরিচয় বিচেনার চেয়ে শহর ও গ্রাম পরিচিতি বেশী বিবেচিত হতো । আমি ছিলাম গ্রামের প্যানেলে । আমি ম্যাগ্যজিন সম্পাদক হিসেবে শাহজাদপুর মহা বিদ্যালয়ে হাতে লিখে একটি দেওয়াল পত্রিকা সম্পাদন করেছিলাম । প্রিন্সিপাল জনাব মো: তাহাজ্জত হোসেন স্যারের সভা পতিত্বে অনুষ্ঠান করে পত্রিকাটি উন্মুক্ত করা হয়েছিল ।

১৯৭৯ সালে শাহজাদপুর মহা বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে রাজশাহী বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধীনে বি.কম পাশ করেছি । ১৯৮০ সালে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ে এম.কম (মার্কেটিং) এ,ভর্তি হয়েছিলাম । ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালীন সময়ে আমি সোনালী ব্যাংকের জুনিয়র ক্লার্ক পদের চাকরির নিয়োগ পত্র পেলাম । ২২.০৯.৮০ তারিখে সোনালী ব্যাংকের চাকরিতে যোগদান করলাম । সোনালী ব্যাংকে চাকরি কালীন সময়ে সংস্কৃতে আদ্য, মধ্য,কাব্যতীর্থ পরীক্ষায় এবং পেশাগত ব্যাংকিং ডিপ্লোমা প্রথম পর্ব পরীক্ষায় উর্ত্তীন হলাম ।

আমাদের মামার বাড়ি ছিল পাবনা জেলার বেড়া থানার নাকালিয়া ইউনিয়ন এর পেঁচা কোলা নামক গ্রামে । আমাদের দাদুর নাম- শ্রী অজিত চন্দ্র চক্রবর্ত্তী আমাদের দিদিমার নাম– শ্রী মতি প্রভাবতী রাণী চক্রবর্ত্তী আমাদের মাতৃদেবীরা ৪ বোন ২ ভাই । মামার বাড়ি যমুনা নদীতে ভেঙ্গে গেলে পাকিস্তান আমলে দাদুর সপরিবারে ভারতে গিয়ে স্থায়ী বসবাস গড়েছেন । আমাদের দুই মামা ১. শ্রী অশোক কুমার চক্রবর্ত্তী ও ২. শ্রী অলোক কুমার চক্রবর্ত্তী । বর্তমানে সপরিবারে ভারতের বাসিন্দা । বীর মুক্তি যোদ্ধা হিসেবে স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসে আমাকে সহ সকল মুক্তিযোদ্ধা কে উপজেলা প্রশাসন হতে সংবর্ধণা দেওয়া হয় । উক্ত অনুষ্ঠানে আমি শ্রীমদ্ভগবদগীতা পাঠ করে থাকি । আমার মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনের কথা নিয়ে বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী ঢাকা ও বিবিসি আমার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ কার প্রচার করেছে । আমার মাতৃদেবী চাইতেন আমি যেন মাতৃদেবীর কাছে থেকে চাকরি করে জীবন নির্বাহ করি । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েও সোনালী ব্যাংকের চাকরি পেয়ে লেখা-পড়া বন্ধ করে চাকরিতে যোগদান করে ছিলাম । আমি জেনে ছিলাম ব্যাংকের চাকরি বাড়ির কাছা কাছি করা যায় । ব্যাংকের চাকরিতে দ্রুত পদোন্নতি হয় । মাতৃদেবীসহ পরিবারের সবার সেবার সুযোগ পাবো ভেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েও পড়ি নাই ।

আমি নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার ইটালী ইউনিয়নের মুন্সি বাঁশ বাড়িয়া নামক গ্রামে বিবাহ করেছি । আমার বিবাহের তারিখ ১৮ শ্রাবণ ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, বুধবার । ইংরেজি ৪ আগষ্ট ১৯৮২ । আমার শ্বশুর মহাশয়ের নাম- শ্রী রবীন্দ্র নাথ মুন্সি । শাশুড়ী মাতার নাম- শ্রী মতি সবিতা রানী মুন্সি । আমার শ্বশুর মহাশয় বামিহাল

উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক ছিলেন। আমার স্ত্রীর নাম নিভা রানী সান্যাল। আমার বড় মেয়ের নাম- চন্দনা সান্যাল। শিক্ষাগত সনদ অনুসারে তার জন্ম তারিখ: ০৮-১২-৮৪। আমার বড় মেয়ের পর ছেলে। ছেলের নাম উত্তম কুমার সান্যাল। তার জন্ম তারিখ: ২৭-১২-৮৬ আমার ছেলের পর আমার ছোট মেয়ে। আমার ছোট মেয়ের নাম- বন্দনা সান্যাল। তার জন্ম তারিখ: ২৭-০৩-৯২।

উচ্চ বিদ্যালয় অধ্যয়ন কালীন সময়ে বর্ষা কালে আমরা নৌকা বা ডোংগা যোগে স্কুলে যাতায়াত করতাম। প্রত্যেক ছাত্রের নিজেদের একটা করে বৈঠা থাকতো। বৈঠা টেনে স্কুলে যাতায়াত করতে হতো। শুকনা মৌসমে আমি শাহজাদপুর স্কুল ও কলেজে হেঁটে যাতায়াত করতাম। খেয়া নৌকায় করতোয়া নদীর থানার ঘাট পার হয়ে যাতায়াত করতাম। আমার বিষয় নিয়ে জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচনা হয়েছে। কাহিনি হলো:-

আমি ২০/০২/১৯৮৩ তারিখে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত পরিদপ্তরের "গোয়েন্দা কর্মকতা" পদের জন আবেদন করেছিলাম। নিয়োগ কারী কতৃপক্ষ দীর্ঘ দিন আমার নামে ইন্টার ভিউ কার্ড ইস্যু করেন না। ইন্টার ভিউ কার্ড ইস্যু না করার বিষয় জানতে চেয়ে নিয়োগ কারী কর্তৃপক্ষ বরাবর ১২ টি রেজিষ্ট্রার্ড আবেদন পত্র পাঠিয়ে ছিলাম। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোন উত্তর প্রদান করেন না। আমি এর প্রতিবাদে তখন অনশন করার ঘোষণা দিয়ে ছিলাম। আমার অনশন ঘোষনার সংবাদ সাপ্তাহিক মুক্তি, পাক্ষিক অনুভূতি সহ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিষয়টি আওয়ামী লীগ সাংসদ কর্নেল (অব:) শওকত আলী (শরিয়তপুর-২) এর দৃষ্টিতে আসে। তখন বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিলনা। সাংসদ কর্নেল (অব:) শওকত আলী (শরিয়তপুর-২) ছিলেন অত্যন্ত ভাল মানুষ। আমার বঞ্চনার বিষয়টি হৃদয় থেকে অনুভব করেন। তখন আমাদের ৬৭ সিরাজগঞ্জ-৬ শাহজাদপুরে সাংসদ ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বাধীনতা বিরোধী। সাংসদ জনাব কর্নেল (অব:) শওকত আলী (শরিয়তপুর-২) আমার বিষয়টি জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করেছিলেন এবং প্রশ্নোত্তরে আলোচনা হয়েছিল।